নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ের কৌশলের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

নির্বাচন সংস্কারের জন্য আওয়ামী লীগের আন্দোলনকে অনেকেই দেখেছিলেন দলটির নির্বাচনী কৌশল হিসাবে; কেননা কেয়ারটেকার সরকার প্রধান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে কোন ব্যাক্তি থাকবেন কি থাকবেন না তা নিয়ে আন্দোলন করলেও নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তনের ব্যাপারে দলটি তেমন উচ্চবাচ্য করেনি বা সেগুলিকে তাদের মূল দাবী হিসাবে উল্লেখ করেনি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ তখন বলেছিলেন যে এটি হচ্ছে বিজয়ের আগে বিজয় অর্জনের তাদের পুরানো কৌশল। দলটির নেতৃবৃন্দ ও সমর্থক বুদ্ধিজীবি, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও অন্যান্যরা তখন বলেছিলেন যে আইনানুগভাবে যাঁর তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবার কথা তিনি যদি অপারগতা প্রকাশ করেতন তাহলে জাতি বেঁচে যেতো। পরবর্তীতে দেখা গেলো সহিংস আন্দোলনের মুখে তিনি অপারগতা প্রকাশ করলে দলটি বিজয় ঘোষণা করে। সে সহিংসতার হিংস্রতায় জনগণ হতবাক ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেও ভেবেছিল যে দলটির দাবী যেহেতু পূরণ হয়েছে তাই তারা রাজপথের আন্দোলন ছেড়ে নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় নামবে। কিন্তু তাদের দাবীর তালিকা দীর্ঘ হতে থাকে। তারা একরে পর এক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, প্রধান উপদেষ্টা, প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের পদত্যাগের দাবীতে অবরোধের মত মারাত্মক ক্ষতিকর কর্মসূচি দিতে থাকে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ বলছেন যে বিচারপতি কে এম হাসানকে দায়িত্ব গ্রহণে বিরত রাখার মাধ্যমে বিজয় অর্জন করা প্রথমে দলটির লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সাধনে তার কর্মীরা যে পরিমাণ হিংস্রতার আশ্রয় নেয়, তা যেভাবে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয় ও ভিতরে ভিতরে জনগণ যেভাবে ধিক্কার দিতে থাকে তাতে দলটি নির্বাচনে বিজয়ের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। তখন তারা কৌশল পরিবর্তন করে ১৯৯৬ সালের পথ ধরে। এখন দলটি দেশকে এমন একটি নির্বাচনের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে যার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না এবং যা ঘটবে মারাত্মক সহিংসতার মধ্যে। সে নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার ক্ষমতায় আসীন হবে তাকে সহজেই আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটানো হবে। জনগণ ততোদিনে ২৮শে অক্টোবরের পৈশাচিক ঘটনা ভুলে যাবে এবং তাদেরকে ভোট দিবে।

তবে বেশ কিছু কারণে দলটির এ কৌশলের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ নিবন্ধে আমরা দেখবো আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জন করার কৌশল নিলে কি কি ঘটতে পারে এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে দলটির জন্য সেগুলি কি ফলাফল বয়ে আনতে পারে।

১. আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জন করলে জাতীয় পার্টি (এরশাদ) যে নির্বাচনে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছোট ছোট অনেক দলও সে নির্বাচনে অংশ নেবে। এ রকম পরিস্থিতিতে যে নির্বাচন হবে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে গেলেও একেবারেই যে থাকবে না তা বলা যায় না। দেশের ভিতরের জনগণকে আওয়ামী লীগ কি বোঝবে? তাদের মূল দুটি দাবীই তো মেনে নেয়া হয়েছে। তারা বিজয় উৎসবও করেছে। দেশের বাইরেও যে দলটি তেমন সুবিধা করে উঠতে পারবে তা মনে হয় না। তবে দেশের

ভিতরে ও বাইরে উক্ত নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা যতটুকুই হোক না কেন নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে আওয়ামী লীগ প্রবল ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে নামবে। সে আন্দোলনে তারা কতটুকু সুবিধা করতে পারবে সে হিসাব কষতে গেলে নিম্নোলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবেঃ

ক. ১৯৯৬ সালে বিএনপি ছিল একা। তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী দুটি দল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন করেছিল। সে দুটি দলের একটি এখন বিএনপির সাথে রয়েছে। ভোটের হিসাবে দলটির জনসমর্থন দশ মত হলেও সঙ্ঘশক্তিতে তারা যে আওয়ামী লীগের কাছাকাছি তা ২৮-২৯ অক্টোবরের এর বিভীষিকাময় সময়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রমাণ করেছে। দেখা যাচ্ছে, পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার কারণে তারা তাদের সংগঠনকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করতে পেরেছে। দেশের এলিট শ্রেণী ও মিডিয়ার ব্যপক সমর্থন যোগাড় করতে না পারলেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। মিডিয়াতে তাদের গ্রহণযোগ্যতার সবথেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে, যেখানে পাঁচ বছর পূর্বে কোন প্রাইভেট চ্যানেলই তাদের খবর দিতো না ও তাদের নেতাদের ছবি দেখাতো না, তারা এখন কিছুটা হলেও দলটির খবরাখবর প্রচারের চেষ্টা করছে। ফলে জোটগত অবস্থানের কারণে রাজপথে বিএনপি আগের থেকে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

খ. অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের প্রধান দুটি দল অনেকটা পৈত্রিক ব্যবসার মত চলছে। ১৯৯১-৯৬ তে বিএনপির পৈত্রিক ব্যবসা দেখার মত কেউ ছিল না। খালেদা জিয়া তখন প্রথমবারের মত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। বিএনপির পরীক্ষিত নেতা-কর্মী বলে তেমন কিছু ছিল না। কাকে বিশ্বাস করবেন আর কাকে করবেন না তা নির্ধারণ করতে তাঁকে বেগ পেতে হতো। ভিন্ন ভিন্ন ধারা থেকে আগত নেতারা দলের স্বার্থের অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন তাঁদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থ। এ কারণে দেখা গেছে দলটির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক মিত্রদের বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলনে বিএনপির অনেক প্রথম সারির নেতা সরাসরি সংযুক্ত থেকেছেন। বেগম জিয়া পরবর্তীতে বিষয়টি হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছিলেন এবং তাদেরকে দলে গুরুত্বহীন করে ফেলেছিলেন। এদের একটি বিরাট অংশ বর্তমানে দলত্যাগ করে এলডিপি গঠন করেছে। ইতোমধ্যে একদিকে যেমন বেগম জিয়া রাজনীতিতে অভিজ্ঞ হয়েছেন, তেমনি তারেক রহমানও সাংগঠনিক কর্মকান্ডে পারদর্শীতা অর্জন করার চেষ্টা করছেন। ১৯৯৬ থেকে বিএনপি এখন অনেক বেশী সংগঠিত। দলের ট্রাবলমেকারদের একটি বড় অংশের বেরিয়ে যাবার কারণে দলটি আগের থেকে বেশী সংহতও বটে।

গ. ১৯৯৬ এবং তার পূর্বের আন্দোলনে বাম দলগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু বর্তমানে কেবলমাত্র মিডিয়া তাদের সাইন বোর্ডগুলোকে টিকিয়ে রেখেছে। তাদের শেষ ভরসা ছিল গোপন বাম সন্ত্রাসী দলগুলো। আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নে বিগত সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে এদের অস্তিত্বও এখন হুমকীর মুখে। ফলে আন্দোলনে বামেরা দলের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া তেমন কোন সহায়তা করতে পারবে না।

ঘ. বিরোধী দলের রাজপথের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে বিএনপি গত মেয়াদে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। শেখ হাসিনার সভাস্থলে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা, কিবরিয়া হত্যাকান্ড, জঙ্গী উত্থান, দ্রব্য মূল্য ইত্যাদি ইস্যুতে শক্তিশালী গণ আন্দোলন গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ থাকা এবং দলটির প্রতি দেশের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার খোলামেলা সমর্থন সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ রাজপথে তেমন কোন

আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেনি। এর জন্য অনেকে দলটির নেতৃত্বের দুর্বলতাকে দায়ী করলেও বিরোধী দলের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে বিএনপির কৌশলও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

ঙ. আওয়ামী লীগের প্রতি মিডিয়ার যে সমর্থন বর্তমানে রয়েছে দলটি আবারো ক্ষমতায় না আসতে পারলে তা ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে পড়বে। প্রিন্ট মিডিয়ার একটি অংশ বিএনপির বিরোধিতা করছে তাদের মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষিত না হওয়ায়। যেমন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী একটি পত্রিকার মালিক তাঁর পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিকদেকে নিয়ে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর সাথে সাক্ষাত করে বলে এসেছিলেন যে তার পত্রিকা দলটিকে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী করতে সর্বাত্মক সহায়তা করবে। বলা বাহুল্য যে এর পিছনে ইসলাম রক্ষা জাতীয় কোন কারণ ছিল না। এনার্জি ড্রিংকের নামে মদ বিক্রির একটি প্রচেষ্টা বিগত সরকার বন্ধ করে দেয়ায় একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির মালিকাধীন পত্রিকা জোটের প্রতি রুষ্ট হয়। আবারো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না গেলে ব্যবসায়িক স্বার্থেই এসব ঘরের ছেলেরা আবার ঘরে ফিরে আসতে পারে। এদিকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বিএনপির নেতাদের মালিকাধীন টিভি চ্যানেলগুলোও পাল্লা দিয়ে আওয়ামী লীগের প্রতি অন্ধ সমর্থনের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে চ্যানলগুলো কর্মী সংগ্রহ করেছিল শেখ হাসিনার নিজে দেয়া নামের একটি টিভি চ্যানেল থেকে। উক্ত চ্যানেলে তাঁর দলের প্রতি পরীক্ষিত অনুগতদেরকে নেয়া হয়েছিল। এরা পরবর্তীতে একটি সিন্ডিকেট তৈরী করে চেষ্টা করে উক্ত দলের প্রতি অনুগত নয় এমন কর্মীকে চ্যানেলগুলোতে ঢুকতে না দেয়ার। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এবারের অভিজ্ঞতার পর বিএনপি এ বিষয়ে নতুন কৌশল নিবে। তাছাড়া মিডিয়াকে তোয়াজ করে নিজের পক্ষে রাখার একটি কৌশল দলটির ছিল। যে কারণে আওয়ামী লীগের প্রতি সবথেকে বেশী রাজনৈতিক অঙ্গীকার সম্পন্ন (কথাটি সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের) প্রাইভেট চ্যানেলটির একজন পরিচালক একজন শীর্ষ সন্ত্রাসীকে বিদেশে পাচারকালে হাতে নাতে ধরা পড়ার পরও সরকার চ্যানেলটির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি। আগামী মেয়াদে তারা হয়তো এ ধরণের কৌশল পুনর্বিবেচনা করে আওয়ামী লীগকে অনুসরণ করবে। উল্লেখ্য যে আওয়ামী লীগের শাসনামলে একটি প্রাইভেট চ্যানেলকে খালেদা জিয়ার সাক্ষাৎকার প্রচারের কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। এ রকমটি হলে আওয়ামী লীগের প্রতি মিডিয়ার সমর্থনের আজকের চিত্র থাকবে না।

চ. ১৯৯৬ সালে যে সকল সরকারী কর্মকর্তা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন একটি বিশেষ ব্যাচের। সে ব্যাচটি এখন অবসর নিয়েছে। এ ধরণের কর্মকর্তার সংখ্যা যে বর্তমানে খুব বেশী নেই তা বোঝা যায় শেখ হাসিনা ও আব্দুল জলিলের বার বার বিদ্রোহের আহ্বানে কোন ফল না হওয়ায়।

এ সকল কারণে আওয়ামী লীগ নতুন সরকারের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে বলে আশা করা খুব কঠিন।

২. যদি ধরে নেয়া হয় যে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মুখে উক্ত সরকার পদত্যাগ করবে এবং আরেকটি কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে তাহলে সে নির্বাচনে দলটির বিজয়ের সম্ভাবনা কতটুকু থাকবে? সে হিসাব পাওয়া যাবে নীচের বিষয়গুলো বিবেচনা করলে।

ক. ৯১ থেকে ৯৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছরই দেশকে অচল করে রাখার পর আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটিয়ে নিজ দলের সমর্থক প্রধান উপদেষ্টার (কিছুদিন আগে খবর বেরিয়েছিল যে তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়নের জন্য চেষ্টা করছেন) অধীনে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যায়। নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে প্রশাসনের এ সকল পদে ছিল তাদের বিশ্বাসভাজনদের ব্যক্তিরা। সে নির্বাচনে দলটি জয়ী হয়। কিন্তু ভোটের হিসাব করলে দেখা যায় যে বিএনপি-জামায়াতের ভোট বিভক্ত না হলে তারা (বিএনপি-জামায়াত) দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হতো। এই হিসাবের ভিত্তিতেই খালেদা জিয়া ২০০১ এর নির্বাচনের পূর্বে বলেছিলেন যে তাঁর জোট দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হবে এবং তা সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। বিএনপির সংগঠন ১৯৯৬ থেকে কোন অংশেই খারাপ অবস্থায় নেই। অপরদিকে আরেকবার ক্ষমতার অংশীদার হতে পারলে জামায়াত যে বহুদূর এগিয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের সম্মিলিত ভোটের হার স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেড়ে যেতে পারে।

খ. খালেদা জিয়া বলছেন যে আবার ক্ষমতায় গেলে তিনি দুর্নীতি দূরীকরণ ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। তিনি যে এ কথা রাখবেন তা আশা করা অবাস্তব নয়। সন্ত্রাস দমনে তিনি যে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। এর আগে কেউ কখন ভাবতে পারেনি যে সরকারদলীয় সন্ত্রাসীদেরকে, যারা দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাও বটে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হত্যা করতে পারে। শেখ মুজিব কিংবা জিয়া যা পারেননি, খালেদা তা পেরেছিলেন। দলীয় পরিচয় ভুলে ও দেশের ভিতর-বাহিরের নানা সমালোচনা উপেক্ষা করে তিনি কঠোর হাতে সন্ত্রাস দমন করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তার কারণে এ ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে তিনি আবারো ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধেও একই ভাবে আপোষহীন যুদ্ধ শুরু করবেন। দুর্নীতি দমন করা গেলে সমাজের এলিট শ্রেণী সহ সাধারণ জনগণ তাঁকে অকুণ্ঠ জানাতে পারে। বিরোধী দলের আন্দোলন মোকাবেলার জন্য এটিকে তিনি একটি কৌশল হিসাবেও নিতে পারেন।

উপোরক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে এ আশা করা কঠিন হয়ে পড়ে যে আন্দোলনের মুখে নবম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হলে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হতে পারবে।

৩. কেউ কেউ মনে করছেন যে আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচন বর্জন করে, সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে তাকে প্রতিরোধ করতে চায় তাহলে দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এবং এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করবে। সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা খুব বেশী বলে মনে হয় না। সেনাবাহিনী যদি আসতোই তাহলে অক্টোবরের ২৯ তারিখে চলে আসতো। শক্তিশালী দুটি রাজনৈতিক জোট রাজপথে থাকা অবস্থায় সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল করাটা যেমন বুদ্ধিমানের পরিচয় হবে না তেমনি তার সম্ভাবনাও খুব কম। কিন্তু যদি সত্যি সত্যিই সেনা শাসন জারী হয় তাহলে আওয়ামী লীগের কতটুকু লাভ হবে তা হিসাব করে দেখা যাক।

ক. কোন একটি দলকে ক্ষমতায় বসাতে সেনা শাসক কাজ করবেন না। বরং তিনি তার নিজের দল গঠন করবেন এবং চেষ্টা করবেন বর্তমানের রাজনৈতিক দলগুলিকে দুর্বল করে দিতে। তার দলে তিনি আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি থেকে নেতাদেরকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে আসবেন যা আওয়ামী লীগ বা বিএনপি কারো জন্য ভালো হবে না।

খ. এ ধরণের একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে ধর্মীয় দলগুলো সেনা শাসনে বেশী লাভবান হয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে সেনা শাসকেরা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধের পক্ষ অবলম্বন করে থাকে। তাছাড়া প্রধান ধর্মীয় দলটি অত্যন্ত সংগঠিত ও একনিষ্ঠ হওয়ার কারণে তাদের দল ভেঙ্গে সেনা শাসকের দলে কেউ যোগ দিবে না। ফলে রাজনৈতিক শূন্যতার ফসল তাদের ঘরেই বেশী যাবে। এ সকল কারণে তৃতীয় শক্তির উদ্ভব নিয়ে যখন চায়ের কাপে জোর ঝড় চলছিল তখন অনেকে বলেছিলেন যে সেনা বাহিনী দেশের শাসনভার গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে আগামী এক দশকের মধ্যে জামায়াতকে ক্ষমতায় আনা।

দেখা যাচ্ছে যে আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জন করলে শুধু আমরা সাধারণ নাগরিকেরাই যে দুর্বিসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবো তা নয়, বরং দলটিও গভীর সংকটে পড়তে পারে। অনেকে বলছেন যে দলটি তার অশুভ ১৩ (আনলাকি থারটিন) শরীকের ফাঁদে পা দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না গেলেই যে বাম দলগুলোর লাভ তার বিষদ ব্যাখ্যার দরকার নেই। ১৩ দলের ১৩ নেতাকে যে আওয়ামী লীগ মনোনয়ন দেবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ নিয়ে জোটের মধ্যে টানপোড়নের খবর প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় আসছে। মনোনয়ন দিলেও তারা যে জনগণের ভোট নিয়ে জিতে আসতে পারবেন তার সম্ভাবনা খুবই কম। ফলে যতদিন আন্দোলন থাকে ততোদিন তাদের লাভ। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বিষয়টি ভেবে দেখলে দলও বাঁচতো জনগণও রক্ষা পেতো।